SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিকতাবাদ: পরম সত্তাকে উপলব্ধির অভিযান

রুপম কামিল্যা

উনিশ শতকে যে সকল উল্লেখযোগ্য চিন্তাবিদ ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ অন্যতম। তিনি নিজেকে কবি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বলে মনে করলেও দার্শনিক বলে দাবি করেননি। অথচ তাঁর যোগলব্ধ অভিজ্ঞতার যে যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনা তিনি করেছেন তা তাঁর দার্শনিক অনুসন্ধানকেই বিবৃত করে। প্রচলিত দর্শন ভাবনা অনুসারে তিনি জগৎ ও জীবনকে মিথ্যা, মায়া বলে বর্ণনা না করে মানবজীবনের তাৎপর্যকে ব্যক্ত করেছেন। মানবজীবন যে আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধির সোপান, সে যে ব্রহ্মের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় তা অনুধাবন করে তিনি মানবজীবনের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছেন। মানবজীবনের চরম সত্যকে অনুধাবনের জন্য যে ব্যক্তির অন্তঃস্থিত গভীরতর সত্তার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন তা উপলব্ধি করে তিনি আধ্যাত্মিক জীবন যাপনে আগ্রহী হয়েছিলেন। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে জীবনের পরম সত্যকে অনুধাবন করে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করা সহজসাধ্য বিষয় নয়। কেননা অহংবাদী মনোভাবের কারণে, অজ্ঞানতার জন্য ব্যক্তি দেহ ও মনকেই জীবনের একমাত্র সত্য বলে মনে করে। তার নিকটে এই দেহ ও মনের অতিরিক্ত কোনও পৃথক মহত্তর সত্তার অস্তিত্ব নেই। ফলে ব্যক্তি দেহ-মনের অন্তরালে অবস্থিত পরম সত্যকে, আত্মার উপস্থিতিকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। তাই ব্যক্তি কীভাবে এই অহংবাদী মনোভাবকে দূর করে ঐ পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে সেই প্রশ্নের বিচারপূর্বক আলোচনাই আমার এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন, আত্মার উপস্থিতিকে আমাদের সর্বত্র স্বীকার করতে হয়, যেহেতু দেহ ও মনের তৃপ্তিতে আমাদের পূর্ণ সন্তুষ্টি সম্ভব হয় না বলে বৃহত্তর সত্য অর্জনের আস্পৃহা আমাদের দেহ ও মনের গন্ডীকে অতিক্রম করতে প্ররোচিত করে। যখন ব্যক্তি দেহ-মনের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে তার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হয়, তার অহং মনোভাব অপসারিত হয় তখন সে অনুধাবন করতে পারে দেহ ও মন একমাত্র সত্য নয়; এই দেহ-মনের অন্তরালে এমন এক পরম সত্তা বিরাজমান, এমন এক সূক্ষ্মতম আধ্যাত্মিক সত্য বিদ্যমান, যাঁকে অনুভব করতে পারলে ব্যক্তির জীবন পূর্ণ হবে, তার জীবনের সকল অতৃপ্তি অপসারিত হবে।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন, এই সত্তার সন্ধান পেতে হলে ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র আমিকে অতিক্রম করে বৃহৎ আমির দিকে অগ্রসর হতে হবে। ক্ষুদ্র আমি সর্বদা জড়জগতের স্থূল বিষয়বস্তুর মধ্যে বিচরণ করে, সে সর্বত্র মোহাচ্ছন্ন হয়ে পার্থিব বিষয়ের মধ্যে আসক্ত থাকে। ক্ষুদ্র আমি তার চাহিদা ও আকাঙ্খা পূরণের জন্য ভোগময় কর্মে লিপ্ত হয়। বিলাসিতা ও সমৃদ্ধির মধ্যে সংশ্লিষ্ট থাকে বলে সে বৃহত্তর সত্তার উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। এজন্য এই সমস্ত পিপাসাময় বস্তুকে পরিহার করে ব্যক্তিকে নিজের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে বৃহৎ আমির অনুসন্ধান করতে হবে; যে আমি হল পরম সত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। এই বৃহৎ আমির সংস্পর্শে এলে ব্যক্তি মোহ-মায়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে। শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণাদ্বৈতবাদী ভাবনা তাঁর চৈতন্যের স্বরূপ বিষয়ক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে। আধ্যাত্মিক একত্ববাদে বিশ্বাসী শ্রীঅরবিন্দ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকেই একমাত্র সৎ বলে মনে

করেন। তাঁর মতে, এই জগৎ ও জাগতিক সকল বিষয় ঐ এক অদ্বয় চৈতন্যেরই সীমিত প্রকাশ। তাই মোহ মুক্ত হলে ব্যক্তি আত্মার সত্যতা উপলব্ধি করে এই জগতে বিস্তৃত সকল চৈতন্যের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে সক্ষম হবে। সে অনুধাবন করতে পারে যে সে শুধু বিশ্বচেতনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার মধ্যে এমন সামর্থ্য বিদ্যমান যার কারণে সে এই জগতকে অতিক্রম করে বিশ্বাতীত চেতনার সঙ্গেও অভিন্নতা উপলব্ধি করতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন, এই বিশ্বাতীত সত্য বা পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে হলে মানবজীবনের মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। মানবজীবনের তাৎপর্যকে ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বৌদ্ধ দর্শনের ভাবধারাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। জগতে ব্যক্তি অসংখ্য দুঃখ ভোগ করে বলে বৌদ্ধ দর্শনে যে ভবচক্র থেকে পরিত্রাণকেই জীবনের অন্তিম উদ্দেশ্য বলা হয়েছে তা শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করেন না। কেননা তাঁর মতে, ঐ পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে হলে মানবজীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানবজীবন আছে বলেই তার দ্বারা ব্যক্তির উত্তরণ সম্ভব হয়। মানব দেহের মাধ্যমেই আত্মা তার ইচ্ছাগুলিকে পূরণ করে, তার কর্মগুলিকে সম্পন্ন করে। এ কারণে তিনি মানবজীবনকে কখনই উপেক্ষা করেননি, শঙ্করাচার্যের মতো মিথ্যা ও মায়া বলে মনে করেননি। বরং তিনি জীবনকে একটি পরম প্রাপ্তি বলে মনে করেছেন, যার মাধ্যমে আমাদের বিকাশ সাধন সম্ভব হয়। এভাবে জগতে ক্রমে বিকাশ সাধন করে ব্যক্তির এককালে দিব্য রূপান্তর সম্ভব হবে।

অবিদ্যাবশত ব্যক্তি দেহ ও মনের মধ্যেই আচ্ছন্ন থাকে বলে সে আত্মার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে সে যখন অবিদ্যাকে অপসারিত করে নিজের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হয় তখন সে নিজের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ককে উপলব্ধি করতে পারে। সে অনুধাবন করতে পারে যে জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিটি বস্তু, চেতন ও অচেতন উভয়ই ব্রহ্মের সীমিত প্রকাশ বলে জগতে অবস্থিত থেকে নিজের অন্তরে সেই ব্রহ্মের উপলব্ধি করাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং এই উপলব্ধিই আমাদের জীবনে পূর্ণতা আনতে পারে, জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারে, এ জীবনকে দিব্য জীবনে পরিণত করতে পারে। তাই জীবনের মূল্যকে উপলব্ধি করতে হলে যে মহত্তর সত্তার অনুসন্ধান করতে হবে তার জন্যে আত্মউত্তরণের প্রয়োজন। ব্যক্তি কীভাবে উত্তরণে সমর্থ হবে তা বলতে হলে শ্রীঅরবিন্দের বিশ্ব সম্পর্কীয় অষ্টবিধ তত্ত্বের উল্লেখ করা প্রয়োজন। অষ্টবিধ তত্ত্ব হল- সৎ, চিৎ-শক্তি, আনন্দ, অতিমানস, মন, পুরুষ[1], প্রাণ ও জড়।[2] এই তত্ত্বের মধ্যে প্রথম চারটিকে বলা হয় পরা গোলার্ধ এবং পরবর্তী চারটিকে বলা হয় অপরা গোলার্ধ। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, অপরা গোলার্ধে জীব অবিদ্যাবশত জড়, প্রাণ ও মন নিয়ে জীবনযাপন করে এবং তার আকাঙ্খা পূরণের প্রয়াস করে। কিন্তু জীব যখন অনুধাবন করতে পারে, জড়, প্রাণ ও মন সমগ্র নয়, তখন সে মনের স্তরকে অতিক্রম করে সৎ ব্রহ্মের দিকে, অপরা প্রকৃতি থেকে পরা প্রকৃতির দিকে অগ্রসর হতে চায়। কিন্তু সৎ ব্রহ্মের

[1] শ্রীঅরবিন্দের মতে, পুরুষ দ্বিবিধ। কামপুরুষ ও চৈত্যপুরুষ। কামপুরুষ ভোগ-বাসনা নিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। অপরদিকে চৈত্যপুরুষ অত্যন্ত শুদ্ধ ও পবিত্র; তাঁর মধ্যে মোহ ও আকাঙ্খা বিন্দুমাত্র নেই।

[2] শ্রীঅরবিন্দ, ২০২০, *দিব্য-জীবন,* অনির্বাণ(অনুবাদক), পন্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পৃ- ২৪০।

নিকটে জীব সরাসরি পৌঁছতে পারে না, তাকে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, জীব বর্তমানে মনের স্তরে রয়েছে, তাই তাকে এই মনের স্তরকে অতিক্রম করে মনের পশ্চাতে যে অতিমানস লোক আছে, সেই লোকে প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু মনের জ্ঞান খন্ড খন্ড জ্ঞান, কেননা তা অখন্ড জ্ঞানার্জনে অক্ষম, অপরদিকে অতিমানসের জ্ঞান খন্ড নয়, অখন্ড ও অদ্বৈতের জ্ঞান। সুতরাং মন ও অতিমানস লোকের মধ্যে যেহেতু বিস্তর পার্থক্য বর্তমান, সেহেতু জীব কীভাবে মনের স্তরের সঙ্গে অতিমানস লোকের সেতুবন্ধন করবে? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, সাধারণ মানুষ তার প্রাকৃত বুদ্ধির কারণে মনে করে যে এদের মধ্যে সেতুবন্ধন সম্ভব নয়। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অতিমানস বিদ্যাশক্তি ও মন অবিদ্যাশক্তি বলে দুটিকে পরস্পরবিরোধী মনে হলেও তাদের মধ্যে সেতুবন্ধন সম্ভব। একটি উপমার সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হল। সূর্যকিরণ মন্থর গতিতে সায়ংকালে নির্বাপিত হয়ে যায়, আবার সেই অন্ধকারই সূর্যোদয় হলে মন্থর গতিতে পুনরায় আলোকিত হয়। জ্যোতি ও আঁধারকে পরস্পরবিরোধী মনে হলেও জ্যোতিই কিন্তু মন্থর গতিতে আঁধারে রূপান্তরিত হয়, আবার আঁধারও পুনরায় জ্যোতিতে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং জ্যোতি ও আঁধারের মধ্যে যে বিরোধ তা সাধারণ মানুষের প্রাকৃত বুদ্ধির বিরোধ। অনুরূপভাবে মনের অবিদ্যাশক্তিও তার আংশিক জ্ঞানকে পূরণ করে যেমন অতিমানসের বিদ্যাশক্তির দিকে ধাবিত হতে পারে, তেমনি অতিমানসের বিদ্যাশক্তিরও পূর্ণ জ্ঞান হ্রাস পেয়ে পুনরায় মনের অবিদ্যাশক্তির দিকে ধাবিত হতে পারে। সুতরাং মন ও অতিমানস বিরোধী শক্তি বিশিষ্ট হলেও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম যেমন অতিমানস শক্তির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জীব রূপে জগতে প্রকাশিত হতে পারে; তেমনি জীবও মনের স্তরকে অতিক্রম করে অতিমানস লোকে প্রবেশ করে নিজেকে ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করতে পারে। একারণেই শ্রীঅরবিন্দ বলেন, মন থেকে অতিমানস লোকে সেতুবন্ধন অসম্ভব নয়। তবে সেতুবন্ধন সম্ভব হলেও সেখানে সরাসরি প্রবেশ করা যায় না, সেখানে যেতে হলে বিভিন্ন ক্রম পরম্পরায় প্রবেশ করতে হয়। তার জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ত্রিপর্বা রূপান্তর। চৈত্যসত্তার রূপান্তর, চিন্ময় রূপান্তর ও অতিমানস রূপান্তর।[3]

চৈত্যসত্তা চিরপবিত্র ও শুদ্ধ, যা সৎ ব্রহ্মের একটি অংশ। চৈত্যসত্তা ব্যক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বিরাজ করে বলে ব্যক্তির এই সত্তা সম্পর্কে কোনও ধারণাই থাকে না। এই সত্তা সম্পর্কে অবগত নয় বলে ব্যক্তি জগতে দেহ ও প্রাণ নিয়েই জীবন অতিবাহিত করে। এই দেহ ও প্রাণ ব্যক্তির বহিঃসত্তাকে বিভিন্নভাবে কলুষিত করলেও ব্যক্তির অন্তঃসত্তা বা চৈত্যসত্তাকে কখনই সে অপবিত্র ও কলঙ্কিত করতে পারে না, তার দিব্য জ্যোতিকে অনুজ্জ্বল বা নির্বাপিত করতে পারে না। দেহ, প্রাণ ও জাগতিক সমস্ত বাহ্য বিষয় পরিবর্তনশীল ও নশ্বর হওয়ায় তারা অবিনশ্বর ও অপরিবর্তনীয় চৈত্যসত্তাকে কলুষিত করতে পারে না। তাদের মধ্যে এমন কোনও সামর্থ্য নেই যার দ্বারা তারা চৈত্যসত্তাকে সীমাবদ্ধ করতে পারে বা তাকে গঠন করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে চৈত্যসত্তাই দেহ ও প্রাণকে নিয়ন্ত্রণ করছে ও তাদের পরিচালনা করছে। শুধু তাই নয়, ব্যক্তির বিকাশও

[3] ঐ, পৃ- ৭৯৭।

চৈত্যসত্তার দ্বারা সম্ভব হয়, এমনকি জগতে ব্যক্তির অবস্থানও তাঁর উপর নির্ভর করে। চৈত্যসত্তার উপর যেহেতু সমস্ত কিছু নির্ভর করে সেহেতু ব্যক্তির অগ্রগতি পূর্ণভাবে সম্ভব না হলেও তাঁকে একটুও দোষারোপ করা যায় না। কেননা ব্যক্তি এসময় দেহ, প্রাণ ও মনের মধ্যে নিমগ্ন রয়েছে, এই দেহ, প্রাণ ও মনের অন্তরালে চৈত্যসত্তা সম্পর্কে তার কোনও ধারণা নেই। তাই সে যদি প্রথম থেকেই জ্ঞাত হত যে তার অন্তরে চিরপবিত্র ও শুদ্ধ দিব্য জ্যোতি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করছে, তাহলে তার পক্ষে নিজের উন্নতি সাধন করা অনেক সহজ হত। কিন্তু এই চৈত্যসত্তা গুহাশ্রিত বলে, অন্তঃস্থিত হওয়ার কারণে আমরা এই সত্তা সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারি না। তাই অন্তরের এই পবিত্র জ্যোতি থেকে যখন কোনও নির্দেশ আসে, তখন ব্যক্তির মন ভুলবশত সেই নির্দেশকে নিজের বৃত্তি বলে মনে করে। ব্যক্তিমনের ইচ্ছা হলে সে এই নির্দেশকে পালন করে অথবা সেই নির্দেশকে বর্জন করে। শুধু তাই নয়, সে অধিকাংশ সময় বহিঃসত্তার আকাঙ্ক্ষা পূরণে বিভিন্ন জড় বস্তু নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে থাকে। ফলে চৈত্যসত্তা এসময়ে তার অন্তরে অপেক্ষা করতে থাকে, কখন মন এই সমস্ত বস্তুকে মন্থরগতিতে অপসারিত করে তার উন্নতি সাধন করবে। এই উন্নতির প্রক্রিয়া ক্রমশ চলতে থাকে, কিন্তু যতক্ষণ এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মন শুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ সে যে তার অন্তরের পবিত্র শুদ্ধ সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে না তাই শুধু নয়, মন শুদ্ধ হলেও যদি সে বহিঃসত্তার সংস্পর্শে থাকে তবে তার পক্ষে চৈত্যসত্তার প্রকৃতিকে সনাক্ত করা সম্ভব হয় না। কেননা, চৈত্যসত্তা সমস্ত বস্তুর নিয়ন্তা, সে প্রকৃতির সকল বস্তুকে পরিচালনা করে, একারণে বহিঃসত্তার যে কোনও অংশের দ্বারা মন যদি কোনও সময় পরিচালিত হয় তাহলে সেই পরিচালিত অংশকেই সে চৈত্যসত্তা বলে মনে করে। ফলে এই ভ্রম তার ততক্ষণ অপসারিত হয় না যতক্ষণ না ব্যক্তির অন্তঃসত্তা বহিঃসত্তাকে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে এদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন, চৈত্যসত্তার উপলব্ধি করতে হলে ব্যক্তিকে শুধুমাত্র জগতের বাহ্যিক স্থূল বিষয়ের মধ্যে নিমগ্ন থেকে অন্তর সত্তার নির্দেশ পালন করলে হবে না, তাকে বাহ্যিক ব্যক্তিসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্তর সত্তার দিকে দৃষ্টি নিবেশ করতে হবে। এর জন্য ব্যক্তিকে বাহ্যিক স্থূল সত্তা ও চৈত্যসত্তার মধ্যে যে ব্যবধান সেই ব্যবধনকে অতিক্রম করতে হবে, তাদের মধ্যে যে প্রাচীর সেই প্রাচীরকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে হবে। এর জন্য তাকে একাত্ম চিত্তে মনোনিবেশ করতে হবে, ধ্যান করতে হবে, কুসংস্কার, ভোগ, বাসনাময় অভিজ্ঞতাকে বর্জন করতে হবে, মনকে সংযত করতে হবে। শুধু তাই নয়, পরম সত্তার নিকটে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে, তাকে আত্ম নিবেদন করতে হবে। এগুলি করতে পারলে বাহ্য ও অন্তঃসত্তার মধ্যে দূরত্ব অপসারিত হয়। ফলে তার অন্তরের দিব্য জ্যোতি প্রস্ফুটিত হয়। এই দীপ্তি প্রকাশিত হলে তার অন্তরের মধ্যে যে সূক্ষ্ম অন্তর্জগৎ রয়েছে, যে বিশুদ্ধ চিন্ময় সত্তা বিদ্যমান, যে চৈত্যসত্তা এতদিন নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে দেহ, প্রাণ ও মনকে বিকশিত করেছিল, তাদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেছিল, সেই চৈত্যসত্তা এখন পূর্ণাঙ্গভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। চৈত্যসত্তা প্রকাশিত হলে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে তার আদেশে জীবন অতিবাহিত করে। চৈত্যসত্তার যে দিব্য জ্যোতি তার আলোকে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, আবেগ, প্রবৃত্তি সমস্ত কিছু প্রজ্জ্বলিত হয়। তার দীপ্তিতে

জগতে ঐক্য ও সংহতি স্থাপন হয়, বিশৃঙ্খলা দূর হয়, মন শুদ্ধ হয়, জগতে পরম আনন্দ বিরাজ করে। ফলে বিশ্বে দেখা যায় সূক্ষ্মতম আধ্যাত্মিক অনুভবের এক প্রবাহ, আরম্ভ হয় চিন্ময় আত্ম-উপলব্ধি।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন, চৈত্যসত্তা প্রকটিত হলেই আমাদের সম্পূর্ণ রূপান্তর হয় না, কেননা চৈত্যপুরুষের উন্মেষ হলে জগতে অনেক পরিবর্তন হলেও, চৈত্যসত্তার দিব্যজ্যোতিতে জড়, প্রাণ ও মন প্রদীপ্ত হলেও প্রকৃতিতে তার নিকৃষ্টতার কিছু চিহ্ন রয়ে যায়। কারণ ব্যক্তির অন্তরে যে উচ্চ জ্যোতি, পরম আনন্দ, শক্তি ও পূর্ণসত্তা বিদ্যমান, জগতে তার প্রকাশ সম্পূর্ণভাবে না হওয়ায় বিশ্বে তার একটি অস্পষ্ট আভাসই পাওয়া যায় কেবল। ফলে নিম্ন প্রকৃতির পরিশোধন যত উন্নত মানের হোক না কেন তা মনের স্তরকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। সেজন্য চৈত্য রূপান্তরের পরে চিন্ময় রূপান্তরের প্রয়োজন হয়। একটি উপমার সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যায়। আকাশে বিরাজমান সূর্যের রশ্মিকে আমরা চৈত্যসত্তার সঙ্গে তুলনা করতে পারি, যেহেতু সূর্যের রশ্মি সমগ্র জগতকে আলোকিত করে অন্ধকারকে দূর করতে পারে, অনেক বস্তুকে বিকশিত করতে সাহায্য করে। যখন মৃত্তিকায় স্থিত পদ্ম ফুলের দিকে দেখি, তখন দেখতে পাই পদ্ম ফুলের কলিগুলি নিদ্রিত অবস্থায় রয়েছে। তাই সূর্যের কিরণ যখন সেই ফুলকে আলোকিত করে তখন সেই ফুল মন্থর গতিতে সতেজ হয়, তার কলি সুষমভাবে প্রস্ফুটিত হয়। পদ্ম ফুলের এই রূপান্তরই হল চৈত্য রূপান্তর। কিন্তু এখানেই তার অভীপ্সার সমাপ্তি হয় না। পদ্ম ফুল আকাশে উড়তে চায়, যে সূর্যোদয় তাকে এবং লক্ষ লক্ষ কমলকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে প্রস্ফুটিত করেছে, সে সেই জ্যোতিকে জানতে চায়, তার মধ্যে নিমজ্জিত হতে চায়, তার সঙ্গে আনন্দে আত্মহারা হতে চায়। পদ্মফুলের এই ঊর্ধ্বলোকের রূপান্তর হল চিন্ময় রূপান্তর।

চৈত্য রূপান্তর হল চিন্ময় রূপান্তরের সূচনামাত্র। তাই চৈত্য রূপান্তরের পরে চিন্ময় রূপান্তর হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। চৈত্য রূপান্তরে ব্যক্তি যে দিব্য জ্যোতির সন্ধান পেয়ে প্রকৃতিকে প্রদীপ্ত করার প্রয়াস করেছে, তাকে সম্পূর্ণ করার জন্য পরম চিন্ময় সত্তার দিকে, ঊর্ধ্বলোকের আধ্যাত্মিক শক্তির দিকে উত্তরণ প্রয়োজন। এই উত্তরণের ফলে সাধক অখন্ড সত্তার, অনন্ত সচ্চিদানন্দের, এক উচ্চ শক্তির, এক শাশ্বত আত্মার সন্ধান লাভ করে। তবে কেবলমাত্র ঊর্ধ্বলোকে উত্তরণ করলে কিংবা অলৌকিক সত্তার নিকট আত্মার উন্মেষ হলেই চিন্ময় রূপান্তর সম্ভব হয় না, পূর্ণ চিন্ময় রূপান্তরের জন্য নিম্নলোক থেকে ঊর্ধ্বলোকে উত্তরণ ক্ষণিকের জন্য হলে হবে না, সেই উত্তরণকে স্থায়ী হতে হবে। শুধু তাই নয়, ঊর্ধ্বলোকের যে জ্যোতি বা পরাচেতনার যে পরিণাম নিম্নলোকে প্রকটিত হবে তাও স্বল্পকালের জন্য হলে হবে না, তাকে স্থায়ীভাবে নিম্নলোকে আরোহণ করতে হবে।

ঊর্ধ্বলোকের শক্তি যখন জগতে প্রকট হয়ে সাধককে স্পর্শ করে তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। এই শক্তি প্রকৃতির মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে বিশৃঙ্খলাকে দূর করে, সমস্ত ভোগবাদী মানসিকতা থেকে সাধককে বিচ্ছিন্ন করে তার মধ্যে উজ্জ্বল দীপ্তি প্রকাশিত করে। তবে এই শক্তির সঙ্গে তার সংযোগ স্থাপন ততক্ষণ চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে এই শক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে পরিচিত হতে না পারে। এই শক্তি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে জ্ঞাত হতে পারলে এক নতুন চেতনার উদ্ভব হয়। যে চেতনার মাধ্যমে সাধক লোকোত্তর

সত্তাকে, জীবাত্মা ও বিশ্বাত্মার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ককে জানতে পারে। শুধু তাই নয়, নতুন চেতনার মাধ্যমে সাধক চেতনার বিবিধ পরিবর্তন করতে পারে, উচ্চতর আদর্শের উপলব্ধি করতে পারে। কেননা এই রূপান্তরের কোনও সীমা নেই, কোনও অন্ত নেই; এ যেন এক অসীমের অভিযান। এই অসীম চেতনার ফলে বিশ্বে সমস্ত স্থূল পার্থিব বস্তুর আবরণ অপসারিত হয়, দেখা দেয় স্থায়ী পরম চিন্ময় সত্তা, যে সত্তার বোধ আমাদের চিরকাল থাকবে। এই চেতনার উন্মেষের ফলে ব্যক্তি জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে সেই স্থায়ী সত্তাকেই প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হয়, সেই স্থায়ী সত্তারই কণ্ঠ শুনতে পায়, তদতিরিক্ত আর কিছু দর্শন করতে ও শ্রবণ করতে পারে না, সর্বত্রই যেন সেই চিন্ময় পরম সত্তাই উন্মেষিত হয়েছে। এই হল চিন্ময় রূপান্তরের স্বরূপ- এখান থেকেই সাধকের চেতনা মানস চেতনাকে অতিক্রম করে চিন্ময় সত্তার চেতনার দিকে অগ্রসর হয়।

চৈত্য ও চিন্ময় রূপান্তর হলেই ব্যক্তির জীবনের পূর্ণ রূপান্তর হয় না, এজন্য এই রূপান্তরের পরে অতিমানস রূপান্তরের প্রয়োজন। বাস্তবিকপক্ষে, প্রত্যেকটি রূপান্তরই তার পূর্ববর্তী স্তরকে অতিক্রম করে ব্যক্তিকে ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করতে সাহায্য করে। চৈত্য রূপান্তরকে সম্পূর্ণ করতে যেমন চিন্ময় রূপান্তরের প্রয়োজন, তেমনি চিন্ময় রূপান্তরকে পূর্ণ করতে অতিমানস রূপান্তর স্বীকার অপরিহার্য। অতিমানস রূপান্তর হল অপরা প্রকৃতি থেকে পরা প্রকৃতিতে উত্তীর্ণ হওয়া। এই উত্তরণের জন্য আমাদের মন যতই প্রয়াস করুক না কেন তার পক্ষে এই উচ্চতর লোকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। কেননা আমাদের মন অবিদ্যা দ্বারা আবদ্ধ। পূর্ববর্তী রূপান্তরের দ্বারা যখন প্রচ্ছন্নময় চৈত্যপুরুষ অনাবৃত হয় তখন তার দিব্য জ্যোতির আলোকে অপরা প্রকৃতি প্রদীপ্ত হলেও, অবিদ্যা অপসারিত হলেও তার দ্বারা পূর্ণ রূপান্তর সম্ভব হয় না। কেননা চৈত্যপুরুষের সে জ্যোতি বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে সর্বদা থাকে না, সেকারণে মানস সংস্কার পুনরায় প্রকটিত হয়। তাই তার দ্বারা মন সাময়িকভাবে শুদ্ধ হলেও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয় না। প্রকৃত রূপান্তর তখনই সম্ভব হয়, যখন অন্তরে চিৎশক্তি প্রকট হয়, আত্মা উন্মেষিত হয়। এসময় সমস্ত স্থূল চিন্তা ও মোহ-মায়া পরিত্যক্ত হয় এবং অন্তরের জ্যোতি ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করে। ফলে চিন্ময় রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এমন এক শক্তির স্ফূরণ হয়, যার কারণে ব্যক্তির মনে এমন স্রোত প্রবাহিত হয়, এমন জোয়ারের উত্থান হয়, যা ব্যক্তিকে চিন্ময় রূপান্তরকে অতিক্রম করে অতিমানস রূপান্তরের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে।

অতিমানসলোকে প্রবেশ করাই মানবজীবনের অন্যতম লক্ষ্য। এই লোকে প্রস্থান করলে এমন এক অসীম ও অনন্তের রাজ্যে প্রবেশ করা যায়, যেখানে মহত্তর এক শক্তি ও সত্তা বিদ্যমান। তবে এই শক্তির নিকটে অগ্রসর হতে হলে তাকে বিভিন্ন সোপান পরম্পরার মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে হয়। ঐ পরম্পরাগুলির প্রত্যেকটি আত্ম-রূপান্তরের এক একটি পর্যায়। এই পর্যায় বা স্তরগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে কোনও ব্যবধান নেই। তাই প্রাকৃত মন থেকে অতিমানস লোকে যাত্রা করতে হলে কিংবা তাদের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে হলে তাকে চতুর্বিধ স্তর অতিক্রম করতে হয়। চতুর্বিধ স্তর হল- উত্তর মানস, প্রভাস মানস,

বোধি মানস ও অধিমানস।[4] এদের প্রত্যেকটি চিৎস্বরূপের এক একটি ভূমি, এরা প্রত্যেকে জ্ঞান ও শক্তিতে পূর্ণ। এদের প্রত্যেকটি ভূমি বিদ্যাশক্তি বা ঊর্ধ্বচেতনার স্তরবিন্যাস, যেখানে শক্তি আবর্তিত হয়ে জড়, প্রাণ ও মনকে বিকশিত করে এক আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটায়।

ব্যক্তির প্রাকৃত মন থেকে অতিমানস লোকে অগ্রসর হওয়ার প্রথম ভূমি হল উত্তর মানস। উত্তর মানসে মন অনেক উন্নত হয়। কেননা মন এই স্তরে অবিদ্যার আবরণকে ভেদ করে বিদ্যার দিকে ধাবিত হয়। সেজন্য মন এখানে আলো ও আঁধারের মধ্যে থেকে আঁধারকে দূর করে ঊর্ধ্বলোকের জ্যোতিতে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। উত্তর মানস ব্যক্তির প্রাকৃত মন নয়, তা চিন্ময় ঊর্ধ্বলোকের সামান্যজ্ঞানের মন। এই মনে অদ্বৈতের বোধ হয়, মূল তাদাত্ম্য সত্যের অনুভব হয়। এই মনের জ্ঞান কোনও সাধারণ মানুষের দ্বারা অর্জিত জ্ঞান নয়, তা অনন্ত প্রজ্ঞার স্বপ্রকাশিত জ্ঞান। এ হল উত্তর মানসের জ্ঞানের দিক। এই জ্ঞানের দিক ব্যতীত উত্তর মানসের একটি ক্রিয়া ও সঙ্কল্পের দিক রয়েছে। এই দিকের মূল বিষয়বস্তু মননশক্তি বা ভাবনাশক্তি। এই মননশক্তি প্রাকৃত বুদ্ধির মনন নয়, তা দিব্য মনন। এই দিব্য মননের মাধ্যমে সে ব্যক্তির হৃদয় ও অনুভূতিকে আলোকিত করে, তাদের পবিত্র ও শুদ্ধ করে বিভিন্ন কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে। এই মননশক্তি যখন ব্যক্তির হৃদয়ে ও প্রাণের মধ্যে প্রকটিত হয়, তখন সেই শক্তি তাদের মন এবং প্রাণকে শুদ্ধ ও পরিবর্তিত করে হৃদয়ে নিয়ে আসে এক নতুন আবেগ, জীবনে এনে দেয় এক নতুন দিশা। এভাবে জীবনের সমস্ত যন্ত্রণা এবং হৃদয়ের সকল আবেগ ও অনুভূতি উত্তর মানসের ভাবনাশক্তির জ্যোতিতে প্রদীপ্ত হয়। শুধু এই জ্যোতি প্রাণ ও মনকে প্রদীপ্ত করে তাই নয়, এই জ্যোতির আলো দেহের মধ্যেও দেখা যায়। সুতরাং উত্তর মানসের ভাবনাশক্তি ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির সাধনা মন্থরগতিতে দেহ, প্রাণ ও মনকে পরিমার্জিত করতে থাকে। তবে উত্তর মানস দেহ, প্রাণ ও মনকে অনেকটা শুদ্ধ করলেও, দিব্যভাবনার দিকে অনেকটা অগ্রবর্তী হলেও তা অবিদ্যার সকল আবরণকে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করতে পারে না। কিন্তু দূরীভূত করতে না পারলেও উত্তর মানস হল চিৎস্বরূপের প্রথম ভূমি, যা তার প্রাথমিক কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে, অবিদ্যার বাধা দূর করার সূচনা আরম্ভ হয়ে গেছে। এভাবে উত্তর মানসের পরবর্তী স্তরে ক্রম রূপান্তর হতে হতে একদিন আমরা সম্পূর্ণভাবে অবিদ্যা থেকে মুক্ত হয়ে পরম সত্তার দিকে অগ্রসর হতে পারব।

উত্তর মানসের পরবর্তী স্তর হল প্রভাস মানস। প্রভাস মানস উত্তর মানসের তুলনায় অধিক শক্তিশালী। প্রভাস মানস উত্তর মানসের মননশক্তির গন্ডিকে পার করে এমন এক উচ্চতর আধ্যাত্মিক জ্যোতির দিকে নিয়ে যায়, যে চিন্ময়ী জ্যোতি বাহ্য প্রকৃতিতে প্রবেশ করলে ব্যক্তির মধ্যে প্রবল আনন্দ দেখা যায়। উত্তর মানসের চিন্তাশক্তির কারণে ব্যক্তির মধ্যে যে শান্ত জ্যোতির আভাস দেখা গিয়েছিল সেই আভাসকেও এই জ্যোতি তীব্র করে ব্যক্তির মধ্যে এক উজ্জ্বল জ্যোতির প্রস্ফুরণ ঘটায়। ফলে উত্তর মানসের জ্যোতিও চিদাত্মার এক মহৎ জ্যোতিতে পরিণত হয়। তবে ঊর্ধ্বলোক থেকে যে মহৎ জ্যোতি ও শক্তি অবতরণ করেছে, সেই বিশাল জ্যোতি

[4] শ্রীঅরবিন্দ, ২০২০, *দিব্য-জীবন,* অনির্বাণ (অনুবাদক), পন্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পৃঃ ৮৩৮।

বাহ্য জগতে সৃষ্ট জড়ময় জ্যোতি নয়, সেই দীপ্তি জড়সৃষ্ট দীপ্তি থেকে পৃথক। এই জ্যোতি কোনও ব্যক্তিমনের কল্পনা নয়; বরং এই জ্যোতি হল ঊর্ধ্বলোকের দিব্য জ্যোতি এবং এই জ্যোতি থেকেই জড়সৃষ্ট দীপ্তি আবির্ভূত হয়। এই জ্যোতি যখন ব্যক্তির অন্তরে প্রজ্জ্বলিত হয় তখন সেখানে শক্তির প্রবল স্রোত দেখা যায় বলে হৃদয় চিন্ময়ী দীপ্তিতে সিক্ত হয়। ফলে এতদিন উত্তর মানসের দ্বারা যে মন্থরগতিতে অল্প অল্প পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল, সেই রূপান্তরে চরম বিপ্লব আসে এবং সেই বিপ্লবও হয় দ্রুতগতিতে।

প্রভাস মানসের মূল বিষয়বস্তু মননশক্তি নয়, তার বিষয়বস্তু হল অন্তর্দৃষ্টি বা দর্শন। সাধারণ ব্যক্তির নিকটে মননশক্তি জ্ঞান অর্জনের মুখ্য পন্থা। কিন্তু অধ্যাত্ম ব্যক্তির নিকটে মননশক্তি গৌণ পন্থা ব্যতীত আর কিছু নয়। কেননা অধ্যাত্ম জ্ঞানকে মননশক্তির মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই এই অধ্যাত্ম জ্ঞানকে অর্জন করতে হলে তার থেকে শক্তিশালী ও উন্নত কোনও কিছুর প্রয়োজন হয়। সেই উন্নততর জ্যোতি হল অন্তর্দৃষ্টি। অন্তর্দৃষ্টি হল আধ্যাত্মিক ও চিন্ময় ইন্দ্রিয়, যার মাধ্যমে আমরা শুধুমাত্র সত্যের মূল বস্তুকে জানতে পারি এমন নয়, তার আকারকেও চিহ্নিত করতে পারি, এমনকি সেই আকারের তাৎপর্যকেও পরিস্ফুট করতে পারি।

উত্তর মানস ও প্রভাস মানসের সম্মিলনেই পূর্ণ হয়ে আমরা মনের তৃতীয় স্তরের দিকে অগ্রসর হই। তৃতীয় স্তর হল বোধি মানস। বোধি মানস উত্তর মানসের মনন ও প্রভাস মানসের অন্তর্দৃষ্টি থেকে অতিরিক্ত কিছু। বোধি হল চেতনার এক শক্তি, যে শক্তি চিৎশক্তির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত। এই শক্তি আমাদের অন্তরের প্রচ্ছন্ন শক্তিকে প্রকাশিত করে। যখন এই অপ্রকাশিত সত্যের অনুভব হয় কিংবা অবিদ্যার আবরণ ভেদ করে এই সত্যের সঙ্গে যখন একাত্ম হতে পারি তখন অন্তরে প্রজ্জ্বলিত হয় একটি স্ফুলিঙ্গ, একটি বহ্নিশিখা। এই বহ্নিশিখা উদ্ভাসিত হলে চিত্ত শান্ত ও স্থির হয়, দেখা যায় চেতনার এক অলৌকিক রূপান্তর।

সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রকৃত বোধিকে জানা সম্ভব হয় না। মানুষ মানস স্তরে বিভিন্ন মানসিক আবেগ ও সংস্কার নিয়ে জীবনযাপন করে এবং এই আবেগ ও সংস্কারের মধ্যে তারা বোধিকে মিশ্রিত করে ফেলে। ফলে ব্যক্তি যাকে বোধি বলে মনে করে তা প্রকৃত বোধি নয়, প্রচলিত বা ভ্রান্ত বোধি। আত্ম উত্তরণ করতে হলে আমাদের প্রচলিত ও ভ্রান্ত বোধির ধারণাকে দূর করে প্রকৃত বোধিকে জানা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু মানস স্তরে ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত কিছুকে জ্ঞাত হতে চায়, অনুধাবন করতে চায়। বুদ্ধি দ্বারা অবগত হতে চায় কোনটি প্রকৃত বোধি আর কোনটি ভ্রান্ত বোধি? কিন্তু বুদ্ধি কীভাবে এদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করবে? বুদ্ধির দ্বারা প্রকৃত বোধিকে জানা মানুষের সাধ্যাতীত। শুধু তাই নয়, বুদ্ধি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্যও বোধির উপর নির্ভর করে। এজন্য বুদ্ধি কখনই প্রকৃত বোধি ও ভ্রান্ত বোধির মধ্যে প্রভেদকে নির্ধারণ করতে পারে না। প্রকৃত বোধিকে জানার জন্য বুদ্ধির নয়, ঊর্ধ্বলোকের রশ্মির প্রয়োজন। অতিমানস লোক থেকে এই রশ্মি যখন বাহ্য প্রকৃতিতে প্রবেশ করে তখন এই রশ্মি বৃষ্টির কণার মতো একটু একটু করে প্রবেশ করে বলে অবিদ্যাবশত ব্যক্তি এই সকল রশ্মিকে তমসাচ্ছন্ন বলে মনে করে। কিন্তু এই সকল রশ্মি তমসাচ্ছন্ন নয়, নির্মল ও উজ্জ্বল। শুধু তাই নয়, স্বধামে এই সকল জ্যোতি বিচ্ছিন্নভাবে থাকে না, থাকে সম্মিলিতভাবে, যেমনভাবে সমুদ্রের সকল তরঙ্গ থাকে একই সমুদ্রে। চেতনার উত্তরণ হলে বোধির এই দীপ্তি ঊর্ধ্বলোক থেকে

জগতে নেমে এসে অবিদ্যাকে অপসারিত করে বিদ্যুৎ আলোকের মতো সমগ্র জগতকে আলোকিত করে। কিন্তু বোধির এই দীপ্তি বুদ্ধির আয়ত্তের বাইরে। তাই বুদ্ধি শুধু এই দীপ্তিকে দর্শন করে, তার দ্বারা বিচ্ছিন্ন বোধিকে একত্রিত করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন এমন এক নতুন বোধির, যা বিচ্ছিন্ন বোধিকে একত্রিত করতে পারে কিংবা কোনও সমস্যা থাকলে তারও সমাধান করতে পারে। কেননা শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, রূপান্তর একবার আরম্ভ হয়ে গেলে মনের সকল বৃত্তিকে বোধির শক্তির মাধ্যমে রূপান্তরিত করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

বোধি মানসের পরবর্তী স্তর হল অধিমানস। বোধি মানস অধিমানসের সূচনা আরম্ভ করে দিয়েছে। অধিমানস হল বিশ্ব চেতনার এক শক্তি। এই শক্তি যখন বাহ্য প্রকৃতিতে প্রবেশ করে তখন ব্যক্তির মধ্যে স্থিত অহংবোধ মন্থর গতিতে বিলুপ্ত হতে থাকে, যেমনভাবে জলপূর্ণ একটি পাত্রের মধ্যে সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকলে ধীরে ধীরে পাত্রটি জলশূন্য হতে থাকে। ফলে ব্যক্তির অহংবোধকে এই স্তরে বৃষ্টির বিন্দুর মতো মনে হয়। এভাবে উচ্চ জ্যোতির আলোকে অহংবোধ দূরীভূত হলে ব্যক্তির মন, বুদ্ধি ও আবেগ শুদ্ধ হয়, এক শাশ্বত বিশ্বাত্মা ও বিশ্বচেতনার উদয় হয়, এক বিপুল আনন্দ দেখা যায়। ফলে অধিমানস স্তরে চিন্ময় রূপান্তর সম্ভব হয়।

অধিমানস চেতনা বাহ্য প্রকৃতিতে প্রবেশ করলে ব্যক্তির এমন অনুভব হয় যে, সে নিজের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে, আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধির ফলে ব্যক্তির মধ্যে অহংবোধ বিলুপ্ত হয় এবং দেখা যায় সকলের সঙ্গে অভিন্নতা উপলব্ধির বোধ। কিন্তু অধিমানস চেতনায় উত্তরণ ঘটলে অহংবোধ বিলুপ্ত হয়ে বিশ্বচেতনার বোধ হলেও অধিচেতনা রূপান্তরের অন্তিম পর্যায় নয়। কেননা অধিমানস চেতনার ক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে খন্ডে খন্ডে। শুধু তাই নয়, এই চেতনা জ্ঞানের দীপ্তিতে অবিদ্যাকে অপসারিত করলেও অবিদ্যার সম্পূর্ণ বিনাশ হয় না, তা কিছু পরিমাণ থেকেই যায়। তাই মূল থেকে যাওয়ায় অধিমানস ভূমিতে অবিদ্যা যে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করবে না, তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। এজন্যই এবার আমাদের অধিমানস চেতনা থেকে অতিমানস চেতনায় অগ্রসর হতে হবে, যা হবে রূপান্তরের সর্বশেষ পর্যায়।

মনের চতুর্বিধ স্তরকে অতিক্রম করে যখন আমরা অতিমানস লোকে উত্তরণ করব তখন চেতনায় আমূল ও চূড়ান্ত রূপান্তর সম্ভব হবে। অতিমানস লোকে উত্তরণ ঘটলে আমরা অপরা গোলার্ধ থেকে পরা গোলার্ধে পৌঁছে যায়, যেখানে মনের কোনও ক্রিয়া সম্ভব নয়। কেননা অতিমানস চেতনাকে অনুধাবন করা মনের সাধ্যাতীত। যেহেতু মন সমস্ত বিষয়কে খন্ড খন্ড ভাবে দেখে। কিন্তু অতিমানস সমস্ত কিছুকে অখন্ডের দৃষ্টিতে দেখে। অতিমানসের জ্ঞান অদ্বৈত ও অখন্ডের জ্ঞান, তার সমস্ত কিছুর মূলে সেই অদ্বৈতবোধই কাজ করে। সুতরাং অতিমানস প্রকৃতির মূল হল অদ্বৈতচেতনা। অতিমানসের এই অদ্বৈতচেতনা মনের আয়ত্তের বাইরে। বস্তুতঃ এই চেতনা হল সৎ ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি। এই শক্তি আধারে নেমে আসলে চিৎশক্তির উজ্জ্বল জ্যোতি প্রকাশিত হয়, এক পরম আনন্দ ও বিপুল প্রশান্তি উন্মেষিত হয়, যার ফলে অবিদ্যা সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হয়ে যায়। এই অতিমানস রূপান্তরের ফলে জগতে বিজ্ঞানঘন পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। এই বিজ্ঞানঘন পুরুষ বা অতিমানসে রূপান্তরের ফলে ব্যক্তি জড়, প্রাণ ও মন বিশিষ্ট ক্রিয়া হতে মুক্ত হয়ে কিংবা অবিদ্যা থেকে পূর্ণভাবে পরিত্রাণ পেয়েই নিবৃত্ত থাকেন না, তাঁর আত্মা জগতের সমস্ত আত্মাকে জানতে চায়,

অভিন্নতা উপলব্ধি করতে চায়। এসময় নিজের সঙ্গে অপরের কোনও ভেদ থাকে না, মিত্রের সঙ্গে শত্রুর কোনও পার্থক্য থাকে না। কেননা সে তখন বিশ্বাত্মার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পায়, আবার নিজের মধ্যে বিশ্বচেতনাকে দেখতে পায়। সুতরাং এ হল সর্বভূতের মধ্যে অভিন্নতা বোধ। আবার সে এখানেই ক্ষান্ত নয়, এই অতিমানস রূপান্তরের ফলে তার মধ্যে এক উচ্চ জ্যোতি, এক শাশ্বত দিব্যানন্দ প্রজ্জ্বলিত হয়, যার ফলে সে বিশ্বাত্মাকে অতিক্রম করে বিশ্বাতীত পরম সত্তাকে, পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে। এরূপ অনুভব হলে সে পরম আনন্দে উন্মত্ত হয়, বস্তুতঃ তার সঙ্গে বিশ্বাতীত পরম সত্তার কোনও ভেদ নেই, তার অন্তঃস্থিত চৈতন্যের সঙ্গে জগততীত পরমাত্মার কোনও পার্থক্য নেই। এতদিন অবিদ্যাবশত অপরা প্রকৃতিতে অবস্থান করায় সে পরম সত্তাকে নিজের থেকে পৃথক বলে মনে করেছিল। কিন্তু অতিমানস লোকে উত্তরণ ঘটায় যখন তার মধ্যে থেকে অবিদ্যা অপসারিত হয় তখন সে অনুধাবন করতে পারে যে, সে পরম সত্তা থেকে কোনও পৃথক সত্তা নয়, তার অন্তরেই পরম সত্তা সর্বদা বিদ্যমান। সুতরাং চৈত্য ও চিন্ময় রূপান্তর এবং মনের চতুর্বিধ স্তরকে অতিক্রম করে যখন ব্যক্তি অতিমানসে রূপান্তরিত হয় তখন সে তার অন্তরের মধ্যেই পরম সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে।

পরিশেষে বলতে হয়, পরম সত্তাকে উপলব্ধি করার জন্য শ্রীঅরবিন্দ যে অতিমানস রূপান্তরের কথা বলেছেন, সেই রূপান্তরের জন্য যোগকে স্বীকার করা অপরিহার্য। কেননা যোগই সাধকের মনকে শুদ্ধ করে চেতনার বিস্তার করতে পারে। তবে শ্রীঅরবিন্দের যোগ কোনও সমন্বয়হীন যোগ নয়, তা হল পূর্ণযোগ। পূর্ণযোগ শব্দটির মধ্যে পূর্ণ শব্দটির অর্থ ব্যক্তির চাহিদা ও আকাঙ্খা পূরণ নয়, তা হল ভাগবত পূর্ণতা ও আত্মার পূর্ণতা। এই আত্মার উপলব্ধির জন্য সাধকের মধ্যে দেখা যায় প্রবল আস্পৃহা, এক অদম্য আকুতি। এই আস্পৃহার পরে সাধককে সমস্ত মনোময় ও ভোগময় বস্তুকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং তারপর ভাগবত সত্তার নিকটে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদন করতে হবে। এভাবে যোগের মাধ্যমে রূপান্তর করতে করতে সাধকের মধ্যে পূর্বে যে ব্যক্তিত্ব ছিল, সেই ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ রূপান্তর হয়। ফলে এরূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে এককালে তার মধ্যে আমূল ও চূড়ান্ত রূপান্তর তথা অতিমানস রূপান্তর সম্ভব হয়। এই অতিমানস রূপান্তরের ফলে সাধক তার অন্তরের মধ্যে পরম সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী

১) অনির্বাণ, *দিব্যজীবন-প্রসঙ্গ*, কলকাতা: শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ২০১৬।

২) গুহ, মিনু (অনুবাদক), *শ্রীঅরবিন্দ মানবজাতির ভবিষ্যৎ বিবর্তন (মর্ত্যধামে দিব্যজীবন)*, কলকাতা: শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ২০২০।

৩) ঘোষ, গীতা, *শ্রীঅরবিন্দ ভাবনা (দিব্যজীবন গ্রন্থের আলোকে)*, পশ্চিমবঙ্গ: শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি।

৪) রায়, দিলীপ কুমার, *শ্রীঅরবিন্দ দর্শন (পূর্ণাদ্বৈতবাদের এক ভূমিকা)*, কলিকাতা: শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ২০১৭।

৫) ভট্টাচার্য, পশুপতি, *দিব্যজীবনের সন্ধানে*, কলকাতা: শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ২০২১।

৬) রায়, সুনীল, *শ্রীঅরবিন্দের দর্শন মন্থনে*, বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭।

৭) শ্রীঅরবিন্দ, *দিব্য-জীবন*, অনির্বাণ (অনুবাদক), পন্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, ২০২০।